১৮৯৮ সালের ২ মার্চ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার ঘোড়শাল গ্রামে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর জন্ম। রাজশাহী কলেজ থেকে দর্শনে বিএ অনার্স (১৯১৮) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে এমএ (১৯২০)। বিএল ডিগ্রিও অর্জন করেছিলেন।

১৯২২ সালে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ এবং ১৯৫৫ সালে ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে অবসরগ্রহণ। এ বছর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি বিশেষ কর্মকর্তার দায়িত্ব পান। একাডেমির পরিকল্পনা রচনায়ও তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। পরে তিনি একাডেমির সচিব ও সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

লেখক হিসেবে বরকতুল্লাহর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *পারস্য প্রতিভা*-র ওপর। *মানুষের ধর্ম* তাঁর দ্বিতীয় বিশিষ্ট বই। এরপর লেখার জগতে বাঁক-বদল ঘটে। একে একে লেখেন *কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত*, *নবীগৃহ সংবাদ*, *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* ও *হযরত ওসমান*।

১৯৭৪ সালের ২ নভেম্বর বরকতুল্লাহর জীবনাবসান হয়।

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

মানুষের ধর্ম

মানুষের ধর্ম

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ

মানুষের ধর্ম
মোহম্মদ বরকতুল্লাহ

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
মুহম্মদ আসাদুল্লাহ্

প্রাচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ২২৫ টাকা

Manusher Dharma by Mohammad Barkatullah Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2021
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 225 Taka RS: 225 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95041-8-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

*কবি প্রকাশনী*র প্রকাশের ভূমিকা

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) একটি স্মরণীয় নাম। সৃজনশীল রসসাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে যাদের আমরা সাহিত্যিক বলি, তিনি সে-অর্থে সাহিত্যিক ছিলেন না। লেখক-জীবনে তাঁর মনোযোগের প্রধান বিষয় ছিল ইসলামের আদি যুগের ইতিহাস, ফারসি সাহিত্য ও দর্শন। এছাড়া অভিভাষণসহ স্বতন্ত্র কিছু প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন। তাই লেখক হিসেবে তাঁর মূল পরিচয় একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে।

মানুষের ধর্ম বাদে অন্য প্রায় সমস্ত রচনার বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে বরকতুল্লাহর মূল মানস-বৈশিষ্ট্যটি সহজে বোঝা যায়। তিনি ছিলেন মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একজন অনুরাগী পাঠক ও রূপকার। তাঁর রচনাবলিতে এ পরিচয়টিই সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট। ইসলাম প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কৃতি নিয়ে দুটি ভিন্ন নামে তিনি দীর্ঘকলেবর গ্রন্থ লিখেছিলেন। এছাড়া লিখেছিলেন তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের জীবনী ও কারবালার ইতিহাসসম্মত কাহিনি। তাঁর বহুখ্যাত *পারস্য প্রতিভা*-ও মুসলিম পারস্যের জগদ্বিখ্যাত কয়েকজন কবি-লেখক-সাধকের কৃতি ও জীবনকাহিনি। এমনকি স্বতন্ত্র প্রবন্ধগুলোতে সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক চিন্তার প্রকাশ ঘটলেও সেগুলোরও কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে মুসলমান সমাজ। এদিক থেকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিচার করলে তাঁকে উনিশ শতকের 'সুধাকর দল'-এর একজন মননশীল উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ইংরেজ আমলে হতচেতন ও অধঃপতিত বাঙালি মুসলমান সমাজকে ইসলাম ধর্মের সুমহান বাণী ও গৌরবকাহিনি শুনিয়ে তাদের আত্মসচেতন ও ইসলামমুখী করে তোলার লক্ষ্যে উনিশ শতকের শেষ দিকে কয়েকজন মুসলিম লেখক কলকাতায় সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। 'সুধাকর' (১৮৮৯) নামক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন বলে সাহিত্যের ইতিহাসকারদের কেউ কেউ এঁদের 'সুধাকর দল' নামে অভিহিত করেছেন। প্রধানত এঁদের দ্বারাই

বাংলা গদ্যে ইসলামের ধর্ম, ইতিহাস, জীবনী, গৌরবগাথা ইত্যাদি কীর্তিত হতে থাকে। খ্রিস্টান পাদরিদের আক্রমণ থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষা করাও সেদিন তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই গোষ্ঠীর প্রদর্শিত পথে পরবর্তীকালে অনেক মুসলিম লেখক পদচারণা করেছেন এবং তাঁদের কিছু কিছু রচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ মূলত এই ধারারই লেখক।

তবে এও সত্য যে বাংলা সাহিত্যে বহমান এই মুসলিম ধারাটিতে বরকতুল্লাহর ছিল একটি সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য। তিনি এর মধ্যে এনেছিলেন মননশীলতার দীপ্তি। আসলে রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৫), কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০), প্রমথ চৌধুরী (১৮৭৩-১৯৪৯), এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) প্রমুখের মধ্য দিয়ে মনীষার যে-ধারাটি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তিনি সেই ধারারই যোগ্য অনুসারী ছিলেন। মেধাবী বরকতুল্লাহ দর্শন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। কর্মজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। এভাবে তিনি এক বিপুল মানস-সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। মননশীল পাঠকের জন্য সেই সম্পদ তিনি দান করে গেছেন তাঁর রচনার মাধ্যমে।

বরকতুল্লাহর মনীষা শুধু জ্ঞানচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি ছিলেন একজন উঁচুশ্রেণির ভাষাশিল্পীও। *পারস্য প্রতিভা* ও *মানুষের ধর্ম*-এ ধ্বনিসম্পদে ভরপুর যে-কবিত্বময় গদ্য তিনি রচনা করেছিলেন তা যে-কোনো পাঠককে মুগ্ধ না করে পারে না। অবশ্য সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বে যে-প্রত্যাশা তিনি জাগিয়েছিলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেষ পর্বে তা সম্পূর্ণ বজায় রাখতে পারেননি। রচনার বিষয়গত পরিবর্তন এর একটা বড় কারণ বটে, কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁর মানস-ধর্মেও একটা পরিবর্তন এসেছিল বলে মনে হয়। *মানুষের ধর্ম* প্রকাশের (১৯৩৪) দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় পর ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় *কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত*। এরপর একে একে মুদ্রিত হয় *নবীগৃহ সংবাদ* (১৯৬০), *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ* (১৯৬৩) ও *হযরত ওসমান* (১৯৬৭)। দেখা যাচ্ছে সাহিত্য ও দর্শনের নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে সরে এসে তিনি, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল্যায়নে,

> ইসলামের ইতিহাসের পাতায় জাতীয় জীবন মহিমার স্বরূপ অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হলেন, অপরদিকে নবলব্ধ জাতীয় চেতনা বশে সাহিত্যকে জনরুচির সমর্থনপুষ্ট করে তোলার তাগিদে পূর্বানুসৃত ভাষারীতির সংস্কারে প্রবৃত্তি হলেন। এর ফলে তাঁর শিল্পীসত্তা স্বভাবধর্ম বিচ্যুত হল, তাঁর স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হল আর ভাষাকে তার দায় পোহাতে গিয়ে অনেকটাই শিল্পশ্রী বর্জিত হতে হল।

তাহলেও এ সত্য স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাঙালি মুসলমানের জীবনে জ্ঞানচর্চা, মনন ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিরাজমান দৈন্য মোচনে যে-অক্লান্ত সাধনা বরকতুল্লাহ করেছিলেন তার তুলনা বড় বেশি মেলে না।

২

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর দার্শনিক ভাবনার অভ্রান্ত স্বাক্ষর ধারণ করে আছে *মানুষের ধর্ম* গ্রন্থটি। মানুষের ধর্ম, ধ্রুব কোথায়, জড়বাদ, চৈতন্য, বস্তুরূপ এবং জীবন প্রবাহ—এই ছ-টি প্রবন্ধের সমবায়ে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালের আগস্টে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধটি 'অনন্ত তৃষা', 'আদিম প্রেরণা' এবং 'জীবন ও নীতি' শিরোনামে স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে বিন্যস্ত হয়। 'চৈতন্য' ও 'বস্তুরূপ' প্রবন্ধদুটির নামকরণ করা হয় যথাক্রমে 'চৈতন্যবাদ' এবং 'বস্তুরূপ ও বস্তু'। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণের আটটি প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত হয় তিনটি নতুন রচনা : ১. পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ, ২. বিজ্ঞান যুগে ধর্ম ও সভ্যতা, ৩. পারমার্থিক জগৎ ও জীবন। এরপর গ্রন্থটিতে আর কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বরকতুল্লাহ দর্শনে শুধু ডিগ্রিপ্রাপ্তই ছিলেন না, তা চর্চাও করেছিলেন। তাছাড়া বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞানের জগৎ নিয়েও তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। *মানুষের ধর্ম* গ্রন্থে এর অভ্রান্ত স্বাক্ষর রয়েছে। বাংলা ভাষায় দর্শনচর্চার ইতিহাসে সন্দেহাতীতভাবে বইটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে দর্শনের ন্যায় জটিল ও দুরূহ বিষয়ের আলোচনা বাংলা ভাষায় খুব কম লেখকই করেছেন। তাও যাঁরা করেছেন তাঁদের অনেকের রচনা পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করলেও সাহিত্য গুণান্বিত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মানুষের ধর্ম* ও *শান্তিনিকেতন*-এর প্রবন্ধাবলি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। দর্শনচর্চায় আর যে-সব বাঙালি লেখক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমরা উল্লেখ করতে পারি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪৮), বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) প্রমুখের নাম। বরকতুল্লাহ এঁদেরই একজন। আর বাঙালি মুসলিম লেখকদের কথা যদি ধরা হয় তাহলে বলতে হয় যে এক্ষেত্রে তিনি শুধু পূর্বসূরিই নন, অনন্যতারও দাবিদার।

৩

মানুষের ধর্ম-এর তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তিতে মোহম্মদ বরকতুল্লাহ পাঠকদের জানিয়েছেন মানব-মনে জীবন-জগৎ, ইহকাল-পরকাল, আত্মা-পরমাত্মা, জড় প্রকৃতি-মনোজগৎ প্রভৃতি দুজ্ঞেয় ও জটিল বিষয়ে সময়ে সময়ে যে-সব প্রশ্ন জাগে সেগুলো সম্পর্কে দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাতের চেষ্টা এ গ্রন্থে তিনি করেছেন। বস্তুত এসব বিষয়ই এখানে তাঁর আলোচনার কেন্দ্রভূমি। এই ভূমিতে বিচরণশেষে একটি সত্য খুব সহজে আমাদের উপলব্ধিতে আসে যে *মানুষের ধর্ম* নানা নামে চিহ্নিত এগারোটি রচনার সংকলন হলেও একটি কেন্দ্রীয় বক্তব্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল লেখকের লক্ষ্য। সেই বক্তব্যটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী 'চৈতন্যের সর্বময়তা'। বস্তুত তাঁর দর্শনের ভিত্তিই রচিত হয়েছে এক 'বিশ্বময় চেতনার' অস্তিত্বের উপর। এই বিশ্বময় চেতনা ও তার প্রাণলীলার প্রকাশ বরকতুল্লাহর মতে কেবল জীবজগতে নয়, জড়জগতেও নিয়ত উপস্থিত। এক গোপনে কিন্তু সচেতন প্রেরণার বশবর্তী হয়ে জগৎ-জীবনের সবকিছু অস্তিত্বমান। লোহার প্রতি চুম্বকের আকর্ষণ, দিকদর্শনযন্ত্রের কাঁটার সর্বদা সুমেরুর দিক মুখ করে থাকা, অণু-পরমাণুর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে না চাওয়া, সূর্যকে ঘিরে গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জের অবিরাম আবর্তিত হয়ে চলা প্রভৃতি সেই প্রেরণার প্রভাবেই ঘটে থাকে বলে বরকতুল্লাহর ধারণা। এরই পাশাপাশি জগতের মধ্যে লক্ষ করা যায় আরেক স্বাভাবিক ধর্ম। লেখক একে বলেছেন আত্মপ্রতিষ্ঠার ধর্ম। জীবজগৎ থেকে জড়জগৎ সর্বত্রই এই ধর্মের উপস্থিতি লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বলেছেন সামান্য একটা লৌহখণ্ডও তার অবস্থান থেকে অপসারণের যে-কোনো প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করতে চায়। সেজন্য তাকে পদাঘাত করলে সে আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাত করে বেদনা দিয়ে।

এই ধর্মের আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় জীবজগতে। উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে শুধু নিজে বেঁচে থাকে না, বংশধরের মধ্য দিয়ে নিজেকে সে প্রসারিত করতে চায় অনন্ত জীবনপ্রবাহে। অবশ্য অন্য প্রাণী থেকে মানুষের একটি পার্থক্য আছে। মানুষ শুধু জৈবশক্তির অভিব্যক্তি নয়, তার মধ্যে আছে আরও একটি নতুন শক্তির অস্তিত্ব। তার নাম আত্মা। এই আত্মাও অমরত্ব চায়। মৃত্যুর পর জীবনের কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না এমন ভাবা মানুষের পক্ষে কঠিন। তাই তার ধারণা আত্মা অবিনশ্বর। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো এক লোকে অর্থাৎ পরলোকে সে অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবে, ভোগ করবে আপন কর্মের ফলাফল পুরস্কার অথবা

শান্তি। পুরস্কারের পরম আকাঙ্ক্ষা থেকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় স্বর্গের বিচিত্র মনোহর সুখচিত্র রচনা করেছে।

মানুষের স্বর্গ-পরিকল্পনা তার ইচ্ছাপূরণ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা সৃষ্ট—এ কথা স্বীকার করেও বরকতুল্লাহ বলেছেন যে এর মূলে এক 'বিরাট সনাতন সত্য' নিহিত আছে। মানুষের জ্ঞান যত সীমাবদ্ধই হোক না কেন, চিরকাল সে বাস্তবকে ছাড়িয়ে অবাস্তব আদর্শের সন্ধানে ছুটে চলেছে। আদর্শের প্রতি এই যে আকর্ষণ, বর্তমানকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রসারণের এই যে ব্যাকুলতা, এটি সমগ্র মানব জাতির ভিতর দিয়ে প্রবহমান। একটি চমৎকার উপমার সাহায্যে বরকতুল্লাহ লিখেছেন যে একই বিদ্যুৎপ্রবাহ নগরীর লক্ষ প্রদীপের মধ্য দিয়ে আপনাকে যেমন প্রকাশ করছে তেমনি একই মহাপ্রেরণা সমগ্র মানব জাতির ভিতর দিয়ে কোনো এক দূর লক্ষ্যের পানে ছুটে চলেছে। সেই মহাপ্রেরণা মানুষের ভিতর দিয়ে আপনি বেঁচে থাকতে চায়। তাই মানুষের বাঁচার এত সাধ। বরকতুল্লাহর মতে,

> মানুষ যে সেই প্রেরণার গোপন উৎস চিন্ময়কে কল্পনায় আনিতে পারিয়াছে ইহা তাহার ভঙ্গুর জীবনের এক পরম সার্থকতা এবং তাহার ভিতরকার সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির আত্মবিকাশ বা অভিব্যক্তির পরিব্যঞ্জক।

সুতরাং এ কথা বলতে হয় যে, স্বর্গ-কল্পনা মানুষের ইচ্ছাপূরণ-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি বলে মনে হলেও সে একে ইচ্ছামতো সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে এক প্রেরণার বশবর্তী হয়ে।

এই প্রেরণাকে অনেকের কাছে অনেক কিছু মনে হতে পারে। নাস্তিক একে প্রকৃতির 'তাড়না' বলতে পারেন, কিন্তু বরকতুল্লাহর মতো বিশ্বাসী মানুষের কাছে এ একটি উদ্দেশ্যময় প্রেরণা, একটি সচেতন অভিব্যক্তি। শুধু তা-ই নয়, এ প্রেরণা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচালিতও বটে। এ থেকেই তিনি ধারণা করেন এর পেছনে কোনো উদ্দেশ্যময় চালক রয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে "যেন কোনও নিপুণ পথবাহী আঁকিয়া বাঁকিয়া, বন-তরুর ধারে ধারে, 'চল' নদীর আঁকে বাঁকে, মুক্ত মাঠের উদাস বুকে, সৃজনের গান গাহিয়া চলিয়াছে।"

বরকতুল্লাহ-কথিত এই প্রেরণা বা চেতনা-সত্তা জগতে বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিরন্তর প্রকাশ করে চলেছে এবং মানব-মনে স্ফুট থেকে স্ফুটতর হয়ে উঠছে। মুসা, ঈসা, মুহম্মদ প্রমুখ মহাপুরুষ এই পরম সত্তাকেই গ্রহণ করেছেন 'আল-লাহ্' (the that—ওই সেই) বলে। হযরত ইব্রাহিমের ক্ষেত্রে পরম সত্তার অনুসন্ধান ও উপলব্ধির অভিজ্ঞতার দীর্ঘ বিবরণ তিনি দিয়েছেন। এঁরা সবাই পরম সত্তাকে আবিষ্কার করেছেন সবকিছুর আদি উৎস ও চূড়ান্ত পরিণতি

বলে। বরকতুল্লাহ মনে করেন এই উপলব্ধিতে পৌঁছনো মানুষের পক্ষে একরকম অনিবার্য। চৈতন্যের একত্ব থেকে বহুত্বে প্রকাশের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে দেখি :

> দেখা যাইতেছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির তাড়নায় ও পর্যবেক্ষণের নেতৃত্বে আমরা যে পথেই পরিক্রমন করি না কেন, ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিশেষে এক মননশীল ও সৃষ্টিধর্মী চৈতন্যের এলাকায়ই আসিয়া পড়ি। একেশ্বরবাদ ও তৌহিদের সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নেই।

বরকতুল্লাহ মনে করেন বিশ্বময় উক্ত চেতন-সত্তাকে জড়বাদের খণ্ডিত দৃষ্টিতে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা জড়বাদীরা জগৎকে দেখেন নিষ্প্রাণ জড়ের পিণ্ডরূপে। তাঁরা বস্তুজগৎকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন বটে কিন্তু বস্তুজগৎ ছাড়াও যে আরেকটি জগৎ আছে, সেই চেতনার জগৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। জগতের বস্তুসমূহের মহাস্তূপের মধ্যে প্রাণসত্তার আবির্ভাব কীভাবে ঘটল এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরা দিতে পারেন না। অখণ্ড সত্তাকে তাঁরা দেখেন খণ্ডিত করে। এই মাটির পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে যে-প্রাণশক্তি, যার স্পন্দনে ক্রিয়াশীল রয়েছে পৃথিবীর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, খণ্ডিত দৃষ্টিতে তাকে দেখা তাই জড়বাদীদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এসব বক্তব্য থেকে বরকতুল্লাহর ভাববাদী ও আধ্যাত্মিক মানসের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আবার অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর প্রগাঢ় ধর্মানুরাগ। তাই অনিবার্যভাবে যখন এ প্রশ্ন ওঠে যে পরম সত্তাকে মানুষ কীভাবে জানতে ও অনুসরণ করতে পারে, তখন এই জটিল প্রশ্নের সমাধান বাতলে দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেও কঠিন হয় না। তিনি বলেন ধর্ম ও ধর্মীয় অনুভূতির মধ্য দিয়েই সাধারণত পরম সত্তাকে অনুভব ও অনুসরণ করা সম্ভব। এই পথেই বিশ্বমনের সঙ্গে মানবমনের যোগাযোগ ঘটতে পারে। কেননা ধর্ম হচ্ছে আসলে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের ভাববিনিময়ের ব্যাপার। বুদ্ধির সাহায্যে জড়জগতে তার সমর্থনে কোনো প্রমাণ যদি না-ও দেখা যায়, তবু ধর্মীয় বিশ্বাস নিছক কল্পনা বা নিরর্থক মনে করা সঙ্গত হবে না। তা যদি হতো তাহলে মহাপুরুসরা এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লাভ করতে পারতেন না এবং তাদের মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা অলৌকিক কার্যাবলি সাধিত হতো না।

অসীমের সঙ্গে সসীমের যোগাযোগ সম্ভব—এ কথা মেনে নেওয়া হলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, এই যোগাযোগের উপায় কী? সৃষ্টির আদি কারণ অসীম সত্তার সঙ্গে সসীম পৃথিবীর নিতান্ত ক্ষুদ্র মানুষের যোগাযোগের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে তুলনার সাহায্য গ্রহণ করে বরকতুল্লাহ বলেছেন "ক্ষুদ্র শিশির বিন্দুতে মহাসূর্য প্রতিবিম্বিত হয়। মানুষের

দেহনিবদ্ধ সীমাবদ্ধ মনেও তেমনি, ইন্দ্রিয় পথ ছাড়া অন্য পথে, বিশ্বমনের একটু জ্যোতিঃকণা প্রতিফলিত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?"

অসীমের সঙ্গে সসীমের যোগাযোগের উপায়ও রয়েছে ওই 'ইন্দ্রিয়নাথ ছাড়া অন্য পথে'। এই অন্য পথের নাম 'অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি' (intuition), দার্শনিক পরিভাষায় যাকে স্বজ্ঞা বলা হয়। কেউ কেউ একে অপরোক্ষানুভূতিও বলেন। বরকতুল্লাহ মনে করেন ইন্দ্রিয়, সংস্কার (instinct), বুদ্ধি—এগুলোর সাহায্যে মানুষ কেবল প্রাত্যহিক জ্ঞান লাভ করতে পারে, পরম সত্তার সাক্ষাৎজ্ঞান এদের সাহায্যে পাওয়া যায় না। তার জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অতীত অনুভবশক্তি বা বোধির। মানুষ তার আপন অস্তিত্ব ও চেতনা সম্পর্কে সরাসরি এই বোধির সাহায্যেই অবহিত হয়ে থাকে। এই শক্তি যখন পরিণত অবস্থায় উপনীত হয় তখন তার 'স্বর্গীয়' আলোয় মানুষ দেখতে পায় তার নিজের ও পরম সত্তার স্বরূপ এবং উপলব্ধি করতে পারে সেই সত্তার সঙ্গে তার নিজের সম্বন্ধকে। বরকতুল্লাহ মনে করেন বোধির সাহায্যে প্রাপ্ত এই জ্ঞান বা উপলব্ধি কোনো প্রমাণ-পরখের অপেক্ষা রাখে না। কেননা,

> আমাদের নিজ সত্তা ও বুদ্ধির সত্তা সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় অনুভবশক্তি (intiuition) ব্যতীত আর কোন প্রমাণ নাই। অথচ এই প্রমাণ এমনই অকাট্য যে, কেহই উহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। আমাদের জীবন-নাটকে এই অদ্ভুত অনুভবশক্তি কিভাবে নেপথ্যে থাকিয়া অভিনয় করিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

৪

সুস্থ ও সুন্দর জীবনগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে মোহম্মদ বরকতুল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ মতামতের প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য গ্রন্থের 'বিজ্ঞান-যুগে ধর্ম ও সভ্যতা' নামক রচনায়। লেখক ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধের সমর্থক হলেও বিজ্ঞান ও প্রগতিবিমুখ ছিলেন না। তাঁর প্রগতিশীল ধর্মানুভূতি ও নৈতিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তথা বিরাজমান বিশ্বপরিস্থিতির মূল্যায়নে। তিনি জানেন এ যুগে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে মানুষ অমিত জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু এই অর্জন কেবল শুভ ফল বয়ে আনেনি, নৈতিকতাবর্জিত ক্ষমতাধর মানুষের দ্বারা অশুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ফলে তা বহু অশুভেরও জন্ম দিয়েছে। এর ফলে পৃথিবীতে দেখা দিয়েছে নানা ধরনের সংকট। একদিকে মানুষের প্রকট দারিদ্র,

অন্যদিকে যন্ত্রসভ্যতার প্রসার—এ দুয়ের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ ধর্মের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ধর্ম এখন আর মানুষের পার্থিব সমস্যাদির সমাধান করতে পারছে না। ধর্মধ্বজীরা রক্ষা করছে নিজের ও শ্রেণিবিশেষের স্বার্থ। ফলে ব্যাপক সংখ্যক অসহায় মানুষ শোষিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। এর উপর ধর্মপ্রবক্তারা জারি করছে কিছু রূঢ় নির্দেশ। ধর্মের এই ব্যর্থতার কারণে তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে জন্ম নিচ্ছে বিক্ষোভ।

এই বিক্ষোভমূলক পরিস্থিতি নিরসনের জন্য জন্ম নিয়েছে নানাবিধ সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদ। কিন্তু বরকতুল্লাহ মনে করেন বাইরের কোনো আইনের চাপে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কেননা এটি মানব-প্রকৃতির অন্তর্গত ব্যাপার। তাই পরিবর্তনের আসল ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের অন্তর, দরকার তার মধ্যে নীতিরোধের উদ্বোধন। কিন্তু ধর্ম ছাড়া নীতির কোনো ভিত্তি নেই। বরকতুল্লাহ বিজ্ঞানের অগ্রগতিরোধের পক্ষপাতী নন, সমাজের পুনর্গঠন তিনিও চান। সেই পুনর্গঠন হতে হবে বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে। এই বোধ দ্বারা চালিত মানুষই প্রকৃত মানুষ। এই বোধকেই বরকতুল্লাহ বলতে চেয়েছেন মানুষের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথকেও আমরা ওই একই কথা বলতে শুনি। বরকতুল্লাহর *মানুষের ধর্ম* প্রথম প্রকাশের কিঞ্চিদধিক এক বছর আগে প্রকাশিত (মে, ১৯৩৩) একই নামের গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের দুটি ধর্ম বা সত্তা চিহ্নিত করে বলেন যে একটি সত্তায় বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। এখানে মানুষ জীবরূপে বাঁচতে চায়। অপর সত্তায় সে ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে নিজের সংকীর্ণ জীবনের চেয়ে বৃহত্তর জীবনে সে বাঁচতে চায়। তাঁর নিজের ভাষায় "স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।"

৫

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর প্রথম গ্রন্থ *পারস্য প্রতিভা*-য় যে ললিত-মধুর ঐশ্বর্যময় ভাষারীতির জন্ম লেখক দিয়েছিলেন, পরবর্তী গ্রন্থ *মানুষের ধর্ম*-এও তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে এ গ্রন্থের ভাষাভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বদলে গেছে। *পারস্য প্রতিভা*-য় কবিত্ব প্রকাশের যতখানি অবকাশ ছিল, বর্তমান গ্রন্থে দার্শনিক তত্ত্বভাবনার প্রকাশে সে-অবকাশ স্বভাবতই কম। কেননা

দর্শনের জটিল তত্ত্বপ্রকাশে চিন্তা ও মননের প্রাধান্য থাকায় শিল্পীসুলভ স্বাধীনতা গ্রহণের সুযোগ কম। আবেগ-উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে এসব ক্ষেত্রে ভাষার ধর্ম হওয়া উচিত শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সংযম-শাসিত। তা সত্ত্বেও এ গ্রন্থের ভাষারীতিও প্রমাণ করে বরকতুল্লাহ মনে-প্রাণে একজন সাহিত্য-শিল্পী। সকল কিছুর মধ্য দিয়ে বিশ্বময় এক মহাপ্রেরণার চলমানতার কথা তিনি বলেছেন। সে-প্রেরণার স্পর্শে সবকিছু স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সেই স্পন্দনের স্পর্শে ভাষাও কীভাবে শিল্পশ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে, তার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে এ আলোচনা আমরা শেষ করতে পারি :

> তিনি চলেন, আর তাঁহার গমনের শিঞ্জিন রব ছন্দে ছন্দে শত যতি বিভঙ্গে বিশ্বের বুকের উপর বাজিয়া যায়। গগনে, পবনে বর্ণে বর্ণে, গন্ধে গন্ধে, কত ছন্দে, তাঁহারই অনন্ত যাত্রার কলরোল বাজিয়া উঠিতেছে। ঐ তরুণ গাছ নব নব বেশে সাজিতেছে নবীন মুকুলের আগমনী জানাইতে। দোয়েল নাচিল, কোকিল কূজিল, নবীন ফলভার আসিয়া নামিয়া গেল,—তারপর তরুদেহের সে লাবন্য খসিয়া পড়িল। মঞ্জরীর শূন্য বৃন্ত শুকাইয়া গেল, পল্লবের শিরাগুলি লাল হইয়া শিথিল হইয়া গেল, কত ছোট শাখা মরিল, কত জীর্ণ বল্কল ঝরিল।

হাবিব আর রহমান
২৫ নভেম্বর ২০২০
email: drhabibiu@gmail.com

প্রকাশকের কথা

মোহম্মদ বরকতুল্লাহর বিশিষ্ট গ্রন্থ *মানুষের ধর্ম*-এর কবি প্রকাশনী থেকে মুদ্রণ প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আছে। বরকতুল্লাহ তাঁর সমকালে প্রচলিত বানানরীতিতে বইটি রচনা করেছিলেন। যেমন রেফযুক্ত বর্ণে দ্বিত্ব ব্যবহার। এ সম্পর্কে আমরা লেখকের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ আসাদুল্লাহ্ সাহেবের সাথে কথা বলি। তিনি বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বানানরীতি বইটির সর্বত্র অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। সে-অনুযায়ী বইটির বানানরীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

এই পুস্তকের প্রথম প্রকাশ ১৯৩৪ সনে, কলিকাতায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, কন্ট্রোল আইন, প্রেস ও কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা এবং সরকারি কাজের অত্যধিক চাপবশত সুদীর্ঘ বিলম্বের পর ১৯৫০ সনে ঢাকা হইতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখন হইতেই চলিয়াছে দেশব্যাপী রাজনৈতিক মাতামাতি এবং ক্রমবর্ধমান আর্থিক দৈন্য। তাই তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দিতেও বেশ সময় লাগিল।

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গুলো দর্শনমূলক হইলেও দুরূহ দার্শনিকতার অবতারণা ইহাতে করা হয় নাই। সাধারণত আমাদের মনে জীবন ও জগৎ, ইহলোক ও পরলোক, আত্মা ও পরমাত্মা, জড় প্রকৃতি ও মনোজগৎ ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে সময় সময় যে সব প্রশ্ন জাগে সেইগুলোর ওপর দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাতের চেষ্টা করা হইয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ই প্রগতিশীল। তাই তিনটি নতুন প্রবন্ধ—(১) পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ, (২) বিজ্ঞান যুগে ধর্ম ও সভ্যতা, এবং (৩) পারমার্থিক জগৎ ও জীবন,—এ বারে সংযোজিত হইল। প্রবন্ধ তিনটি কিছু দিন পূর্বে মাহেনও পত্রিকায়, উহার সম্পাদক সাহেবের সৌজন্যে, প্রকাশিত হইয়াছিল। আগের লেখাগুলো ১৯১৯-২২ সনে মোসলেম ভারত, সওগাত ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়। সে দিনের সমঝদার পাঠকগণের অনেকেই হয়তো এখন পরপারে। যাহারা এপারে আছেন তাঁহাদের অনেকের মনে হয়তো এ গ্রন্থ অতীত দিনের এক হারানো স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবে, এরূপ আশা করি। ইতি—এপ্রিল, ১৯৫৯

—গ্রন্থকার

ভূমিকা

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য এমএ, পিআরএস, মহোদয়ের লিখিত]

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক মোহম্মদ বরকতুল্লাহ সাহেবের 'মানুষের ধর্ম' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে সাহিত্যিক মাত্রেই যে আনন্দিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা সাহিত্য যে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করিতেছে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন তাহার বর্ধমান বৈচিত্র্য। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সহিত তুলনা করিলে সহজেই দেখা যাইবে যে বাংলা সাহিত্য কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বাস্তব ও আদর্শকে জনসাধারণের সমক্ষে আনিতে অধিকতর চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞান ও দর্শন, সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রবিদ্যা, আজ উপন্যাস ও কবিতার সহিত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় সমান স্থান পাইতেছে ও তাহাদের পাঠকেরও অভাব ঘটিতেছে না। এমনকি শিশুসাহিত্যে ও শব্দ-কোষে সকল বয়সের সাধারণ পাঠকদিগের জন্য জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা বঙ্গসাহিত্য আজ দাবি করিতে পারে। যে সকল প্রাচীন পুস্তক বা প্রবন্ধের সমসাময়িক পাঠক লাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই আজ তাহা পুনর্মুদ্রিত হইয়া বিদ্বজ্জনের মনোরঞ্জন করিতেছে।

যে সকল লেখক বঙ্গ সাহিত্যকে স্বাবলম্বী হইতে সহায়তা করিয়াছেন 'পারস্য প্রতিভা'র লেখক বরকতুল্লাহ সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। লেখকের ভারতীয়, ইসলামীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যুৎপত্তি কোথাও তাঁহার স্বাধীন চিন্তাকে ব্যাহত করে নাই—বরং তাহাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। শিক্ষা তাঁহাকে ভারাক্রান্ত করে নাই, বরং বাহনরূপে তাঁহার ভাবকে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতি দিয়াছে। পুস্তকটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে লেখক কোথাও তাঁহার ধর্মমতের প্রচার করিবার চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যে যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাঁহার নিজের ধর্মপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। মতবাদের ব্যাখ্যার মূলে আদর্শটি প্রচারিত হওয়ায় তাহা অধিকতর চিত্তকর্ষক হইয়াছে। তাঁহার জড়বাদের বিরুদ্ধে অভিযান ও

অনুভূতির সাহায্যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার সম্বন্ধে মত বৈদান্তিক ও সুফি উভয়কেই আকৃষ্ট করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি মায়াবাদকে প্রশ্রয় দেন নাই—বরং প্রাকৃতিক জগতের যাহা কিছু গ্রহণীয়, করণীয় ও বরণীয় তাহাকে জীবনের উপভোগ, উপায় ও উদ্দেশ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহার করিতে লেখক আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় লেখকের গভীর চিন্তা বা অনুভূতির সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। মাত্র দুইশত পৃষ্ঠায় এত পঠিতব্য বিষয়ের একত্র সমাবেশ প্রায়ই দেখা যায় না। যাহারা মনে করেন সংস্কৃত-বহুল বাংলা ভাষায় অসংস্কৃতজ্ঞের পক্ষে লেখা বা বোঝা দুষ্কর তাঁহাদিগকে আমি এই পুস্তিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ও অনুপ্রবিষ্ট দার্শনিক লেখকের ভাষাসম্পদ সুধীবৃন্দকে মোহিত করিবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বিষয়ের জটিলতাকে ভাষার সরলতা অনেক পরিমাণে অপসারিত করিয়াছে। ভাষা ও ভাবের এইরূপ সাহচর্য সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বঙ্গ সাহিত্যের নবজাগরণের দিনে যশস্বী লেখকের চিন্তাপ্রবাহ ভাবুক চিত্তকে সরস করুক ইহাই আমার আশা, ইচ্ছা ও প্রার্থনা। অলমতি বিস্তরেণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১লা আষাঢ় ১৩৪৫ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য

সূচিপত্র

অনন্ত তৃষা ২১
আদিম প্রেরণা ২৭
জীবন ও নীতি ৩২
ধ্রুব কোথায় ৩৯
জড়বাদ ৫৫
পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ ৬৫
চৈতন্যবাদ ৭৬
বস্তুরূপ ও বস্তু ৮৫
জীবনপ্রবাহ ৯৪
বিজ্ঞান যুগে ধর্ম ও সভ্যতা ১০৮
পারমার্থিক জগৎ ও জীবন ১২০

অনন্ত তৃষা

বস্তুজগতের সাধারণ ধর্ম আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সামান্য লোষ্ট্র খণ্ড যে স্থানে বসিয়া আছে সেখানে তুমি বসিতে পারিবে না। যতই কেন ক্ষুদ্র হউক না, সে যেখানে আপন অধিকার সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে সেখান হইতে সে সহজে নড়িবে না। তাহাকে সরাইতে চেষ্টা করো সে প্রতিরোধ করিবে। তুমি তাকে পদাঘাত করো, সেও প্রতিঘাত করিবে, তোমার পায়ে বেদনা দিবে। তুমি ইহাকে প্রতিক্রিয়া (Newton's Law of Reaction) বলিয়া মনে করো। তাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করো, সে তোমার শক্তিকে সাধ্যমতো ব্যাহত করিবে। তার অণু কণাগুলো একে অন্যকে আঁকড়িয়া থাকিবে, যেন তারা সব পরস্পর ভাই। প্রবলতর শক্তি যখন তাহার অঙ্গে ক্রমাগত আঘাত করিতে থাকে তখন তাহার আহত শরীরে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া ওঠে। এরা এক একটি শক্তি কেন্দ্র। একটি রজ্জুকে তুমি ছিন্ন করিবার চেষ্টা করো, সে সহজে তোমার ইচ্ছা পূরণ হইতে দিবে না। যে অগণিত অণুরাশির উহা সমষ্টি, সেগুলো কিছুতেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবে না। কোনো এক অলক্ষ শক্তি যেন তাহাদের ভিতরে থাকিয়া তোমার বিরুদ্ধে তাহাদের মরণপণ বিদ্রোহ জাগায়। উহাকে আঙিনায় ফেলিয়া রাখো, উহার জড়সূত্রগুলো অনেক দিন বায়ু জল ও মৃত্তিকার ক্ষয়কর প্রভাবক এড়াইয়া টিকিয়া থাকিবে; তার পর ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বস্তুর ভিতর এই যে অজ্ঞাত প্রয়াস, এ কি শুধু তার অণুতে বিচ্ছুরিত কোনো যৌগিক শক্তির প্রভাব মাত্র, না পদার্থের ভিতর এক অবচেতন অবলুপ্ত আত্মার গোপন অবস্থিতির সক্রিয় প্রকাশ? চুম্বকের ভিতর কিসে অনুভূতি জাগে লৌহের সান্নিধ্যে, সে সচেতন প্রাণীর মতো লৌহকে চাপিয়া ধরে। দিগদর্শন যন্ত্রের কাঁটা কোন দূরাগত আকর্ষণ অনুভব করে? সে পতিব্রতা নারীর মতো সদা সুমেরুর দিকে মুখ করিয়া থাকে; চেষ্টা করিলেও তার মুখ অন্য দিকে ফিরান যায় না। সাগর বারি কোন অনুভূতির ফলে দূর আকাশে পূর্ণচন্দ্রের আগমনী বুঝিতে পারে? তার অগাধ জলরাশি নিরূপিত সময়ে উথলিয়া ওঠে ও উত্তাল তরঙ্গমালা দারুণ মত্ততায় তটভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া দূর দিগন্তের পানে ছুটিতে থাকে। আকাশের সূর্যে কি ইচ্ছাশক্তি নিহিত আছে যাহা দুরন্ত বালকের ন্যায় ঐ বিশাল গ্রহগুলোকে বাঁধিয়া নির্ধারিত চক্রপথে অবিরাম ঘুরাইতেছে?

উদ্ভিদ জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াস অতি সুস্পষ্ট। সামান্য লতাটিও

প্রকৃতির সহিত অহর্নিশ যুঝিয়া আপনার অধিকার দৃঢ় করিতেছে। শিকড়ের সূক্ষ্ম অঙ্গুলি দিয়া যে মৃত্তিকার বুক চিরিয়া রস পান করে; পাতার বেষ্টনী গড়িয়া আলো ও বাতাস হইতে চৌথ সংগ্রহ করে। এই রূপে সে আপনার ক্ষুদ্র সংসার রচনা করে। যে দিকে কিছু লম্বমান থাকে সেই দিকে তার কোমল তন্তুগুলো ডানা মেলিয়া তিলে তিলে অগ্রসর হয় ও পরিশেষে উহাকে জড়াইয়া ধরে। কীসে ঐ আশ্রয়হীন লতার অন্ধ তন্তুগুলোর ভিতর উহার অজানা লক্ষ্যের দিকে অনুভূতি জাগায়? কোন প্রচ্ছন্ন বুদ্ধির প্রবাহ সেগুলোকে অলক্ষে চালিত করিয়া কোনো আসন্ন তরু শাখায় বা শুষ্ক দণ্ডে সুকৌশলে ঘিরিয়া ঘিরিয়া জড়াইয়া দেয়? আত্ম-প্রতিষ্ঠার কী বিচিত্র উৎসব ঐ লতার জীবনে পরিস্ফুট। তৃণের নবজাত অঙ্কুরের অভ্যন্তরীণ কোন অনুভূতি উহাকে অন্ধকার মাটির গহ্বর হইতে আলোকের জগতে পথ দেখাইয়া আনে? উহার কচি দেহ কোন শক্তি-বলে নিজের অপেক্ষা সহস্রগুণ ভারী মাটির বোঝা ঠেলিয়া অবলীলাক্রমে বাহির হইয়া আসে?

জীবজগতে এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার ধর্ম অধিকতর বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায় (Preservation of the Self extended to perpetuation of the Self)। জীব শুধু বাঁচিয়া থাকিয়াই সন্তুষ্ট নহে, সে যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রসারিত করিতে চাহে। অর্থাৎ সে সন্তান-সন্ততির ভিতর দিয়া নিজে চিরকালই বাঁচিয়া থাকিতে ব্যগ্র। সেই জন্যই জীবনজগতে সন্তান বাৎসল্যের এরূপ প্রবল অভিব্যক্তি। ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে পাখি, চতুষ্পদ জন্তু এবং মনুষ্য, সকলের মধ্যেই এই সন্তান বাৎসল্য অতিশয় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই যে বাৎসল্যের বিরাট অভিনয় ইহা যে সকল সময় সজ্ঞানে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নহে। ইতর প্রাণীগণই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ইহাতে মনে হয়, জীবজগতের প্রকৃতিতেই এমন একটি প্রেরণা নিহিত রহিয়াছে যে যাহা আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং সন্তান যখন আপনার পায়ে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে শিখে তখন উহা আপনি প্রশমিত হইয়া আসে। জীব সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করে না। তাহার আভ্যন্তরীণ জৈবশক্তি (Life Force) তাহার ভিতর দিয়া লীলা করিতেছে, দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়া অন্ততকাল ধরিয়া যুগমঞ্চে বিচরণ করিতেছে। জীব সেই জৈবশক্তির অভিব্যক্তির আধার মাত্র। বসন্ত যেমন নব ফুলফল কোকিল কাকলি লইয়া নির্ধারিত সময়ে জগতে আবির্ভূত হয়, হেমন্ত যেমন কুয়াশার ম্লানিমা লইয়া নির্দিষ্ট পর্যায়ে ধরার অঙ্গনে ছায়াপাত করে, জৈবশক্তির আত্মপ্রসারণ চেষ্টাও (Biological Evolution) সেইরূপ নৈসর্গিক। উহা দারুণ তৃষ্ণা, দুর্ভেদ্য মোহ লইয়া, জীবদেহে সাড়া দিয়া ওঠে। তাহারই ফলে সন্তানোৎপাদনে ও বংশ রক্ষায় জীবের এত মোহময় উন্মত্ততা।

মানুষও এই নিয়মের অধীন। মানুষ যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়া নিজকে অনন্তকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য জীবনব্যাপী চেষ্টা করিতেছে। মানুষের অর্থোপার্জন, প্রতিপত্তি, যশোলিপ্সা সমস্তই আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য। সে প্রতিষ্ঠা শুধু

মানুষের মনে সময়ে সময়ে জীবন-জগৎ, ইহকাল-পরকাল, আত্মা-পরমাত্মা, জড় প্রকৃতি- মনোজগৎ প্রভৃতি দুর্জ্ঞেয় ও জটিল বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোকে এসব প্রশ্নেরই আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। এটি নানা নামে চিহ্নিত এগারোটি রচনার সংকলন হলেও একটি কেন্দ্রীয় বক্তব্যের প্রতিষ্ঠাই লেখকের মূল লক্ষ্য। সেই বক্তব্যটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী 'চৈতন্যের সর্বময়তা'। বস্তুত লেখকের দর্শনভাবনার ভিত্তিই রচিত হয়েছে 'বিশ্বময় চেতনার' অস্তিত্বের ওপর। এই চেতনা ও তার প্রাণলীলার প্রকাশ লেখকের মতে কেবল জীবজগতে নয়, জড়জগতেও নিয়ত উপস্থিত। এক গোপন কিন্তু সচেতন প্রেরণার বশবর্তী হয়ে জগৎ-জীবনের সবকিছু অস্তিত্বমান। কেবল দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে নয়, এ বইয়ে প্রত্যক্ষীভূত সামাজিক মানুষের ধর্মও নির্ণিত হয়েছে ওই বোধ-বিশ্বাস থেকেই। আর সেই ধর্ম হচ্ছে সার্থকতা সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা নয়, তাকে সকল মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়া। লেখকের আশা ও বিশ্বাস যে, সত্য-ধর্মের এই উপলব্ধি যেদিন মানুষের মধ্যে জাগবে সেদিন পৃথিবীতে হয়তো এমন এক বিরাট গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটবে যেখানে একের অধিকার অন্যের দ্বারা দলিত হবে না, যেখানে 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।'